গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ২৪ সংখ্যা | ২৫ - ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

স্কুলে ইন্টার্ন শিক্ষক
সর্বনাশের অশনিসংকেত

মুখ্যমন্ত্রী ১৪ জানুয়ারি নবান্নে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত একটি সভায় ঘোষণা করেছেন, বিদ্যালয় স্তরে নতুন পাস করা স্নাতকদের ইন্টার্ন হিসাবে কাজে লাগানোর কথা তাঁরা ভাবছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে। ইন্টার্ন শিক্ষক নিয়োগ করতে পারলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

ভিক্ষা নয়, স্থায়ী নিয়োগ চাই ঃ ১৭ জানুয়ারি পুরুলিয়ার ডিএম দপ্তরের সামনে ছাত্র-যুব বিক্ষোভ

রাজ্য জুড়ে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যে তীব্র শিক্ষক-সংকট তৈরি হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী কি সত্যিই তা মেটাতে চান? চাইলে ইন্টার্ন শিক্ষক নিয়োগের দ্বারা কি তা সম্ভব? কেন তিনি স্কুল সার্ভিস কমিশনের দ্বারা প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগের কথা বলছেন না? যে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক যুবতী লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বি এড ট্রেনিং নিয়ে চাকরির আশায় বসে আছেন তাঁদের কথা কেন মুখ্যমন্ত্রী ভাবলেন না? ইন্টার্ন শিক্ষক নিয়োগ কি তাঁদের প্রতি সরকারের চূড়ান্ত বঞ্চনা নয়?

রাজ্যের অধিকাংশ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে হাজার হাজার শিক্ষক পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে থাকায় সেগুলিতে পড়াশোনার মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে। রাজ্যের শিক্ষাপ্রেমী মানুষ দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার নানা দাবি নিয়ে আন্দোলন করে চলেছেন। সিপিএম সরকার প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ইংরেজি ও পাশফেল তুলে দিলে প্রতিবাদে যে ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেখানেও পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ছিল অন্যতম দাবি।

তৃণমূল শাসনে ২০১২ সালের পর স্কুল সার্ভিস কমিশন মারফত শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা না হওয়ায় শূন্যপদের সংখ্যা

দুয়ের পাতায় দেখুন

প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেলের দাবি
অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির

১৯ জানুয়ারি কলকাতার উল্টোডাঙায় ইকমার্ড হলে সর্বভারতীয় সেভ এডুকেশন কমিটির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ প্রকাশ ভাই শার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ১৪টি রাজ্য থেকে প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির শিক্ষার উপর সর্বাত্মক আক্রমণ নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেন।

এই শিক্ষাবর্ষেই প্রথম শ্রেণি থেকে পাশফেল চালুর দাবিতে সারা দেশ জুড়ে আন্দোলনকে তীব্রতর করার সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া শিক্ষার গৈরিকীকরণ ও ব্যবসায়ীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য আঞ্চলিক স্তর থেকে শুরু করে রাজ্য ও সর্বভারতীয় স্তরে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সাধারণ সম্পাদক ডঃ অনীশ রায় ও সেভ এডুকেশন কমিটির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি ডঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন।

ধান কেনায় দুর্নীতি
ফড়েরাজ নিয়ন্ত্রণে উদাসীন সরকার

এ রাজ্যে কৃষকদের মূল সমস্যাগুলি সমাধানে রাজ্য সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই। সরকারি কিষাণমান্ডিগুলিতে সহায়কমূল্যে ধান কেনা হলেও টোকেন পাওয়া নিয়ে চলছে নানা দুর্নীতি। দীর্ঘ লাইন এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায় কৃষকরা ঠিকমতো ধান বিক্রি করতে পারছেন না। এই জটিলতা সরকার দূর না করায় কৃষকরা ফড়েদের কাছে কম দামে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। সার-বীজ-কীটনাশক সহ কৃষি উপকরণের দাম আকাশছোঁয়া। সরকার তা নিয়ন্ত্রণে কোনও ভূমিকাই নিচ্ছে না। চাষের খরচ বেড়ে যাওয়ায় এবং ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়াতে কৃষকরা ঋণের জালে জড়াচ্ছেন, অনেকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন।

সাতের পাতায় দেখুন

পঞ্চম শ্রেণির ৫৬ শতাংশ ছাত্র মাতৃভাষায় লেখা দ্বিতীয় শ্রেণির বই পড়তে পারে না— দায় কার

সারা দেশেই সর্বনাশের গভীর খাদের মধ্যে শিক্ষার মান। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সর্বশেষ প্রকাশিত 'অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন রিপোর্ট-২০১৮' সেটাই স্পষ্ট করল।

সারা দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাধারণ মানুষ, অভিভাবকরা ২০০৯ সালে পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সময় ঠিক এই আশঙ্কাই করেছিলেন। সেদিন তাঁরা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন এই বিপদকেই রোখবার জন্য। তা আজ দগদগে ঘায়ের মতো সারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ফুটে বেরোচ্ছে।

১৫ জানুয়ারি প্রকাশিত ওই রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণির প্রায় ৫৬ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণির উপযুক্ত মাতৃভাষায় লেখা গদ্য পর্যন্ত পড়তে পারে না। যত উপরে উঠেছে হাল তত খারাপ হয়েছে। দেখা যাচ্ছে অষ্টম শ্রেণিতে পড়া ৭৩ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী কোনও রকমে দ্বিতীয় শ্রেণির বই পড়তে পারলেও তার উপরের কোনও শ্রেণির বই পড়তে পারছে না। এমনকী তাদের অর্ধেক জন অক্ষর, যুক্তাক্ষর চেনে না, অনেকে সংখ্যা চিনতে না পারলেও অষ্টম শ্রেণিতে উঠে গেছে। অষ্টম শ্রেণির অর্ধেকের বেশি ছাত্র শিশু-পাঠ্য গল্পও পড়তে পারছে না। অষ্টম শ্রেণির ৫৬ শতাংশ এবং পঞ্চম শ্রেণির ৭২ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী সাধারণ ভাগ বা গুণ করতে পারে না।

যদিও সর্বভারতীয় গড় দেখে সারা দেশের আরও গভীর সংকট-চিত্র পুরো বোঝা যাবে না। ঝাড়খণ্ডের মাত্র ৭০.৬ শতাংশ, আসামের ৬৬.৫ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ৬৫.৬ শতাংশ

দুয়ের পাতায় দেখুন

৩০ জানুয়ারি মহামিছিল
জমায়েত ঃ হেদুয়া, বেলা ১টা

স্কুলে ইন্টার্ন শিক্ষক

একের পাতার পর

মারাত্মক আকার নিয়েছে। গত সাত বছরে যত শিক্ষক অবসর নিয়েছেন তার কতটুকু পূরণ করেছে সরকার? সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে বিশেষত উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগে শিক্ষকের অভাবে পড়াশোনা বন্ধ হতে বসেছে। অতীতে সিপিএম কিংবা বর্তমানের তৃণমূল দুই সরকারই স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের পথে না হেঁটে কন্ট্রাকচুয়াল টিচার, প্যারা টিচার নিয়োগ করে ভেঙে পড়া শিক্ষার কাঠামোটাকে কোনও ক্রমে খাড়া রাখার চেষ্টা করেছে। ফলে রাজ্যে শিক্ষার মানের অবনমন ঘটেই চলেছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থের কথা ভেবে কোথাও কোথাও স্কুল কর্তৃপক্ষ আংশিক সময়ের শিক্ষক নিজেদের খরচে রাখতে বাধ্য হয়েছে। বহুক্ষেত্রে এই শিক্ষকদের বেতন দিতে ছাত্রদের থেকে স্পেশাল ফি আদায় করছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এর দ্বারা সমস্যার সমাধান তো হয়নি বরং এতে নতুন সমস্যা তৈরি হয়েছে। একই পরিমাণ কাজ করেও প্যারাটিচাররা পূর্ণসময়ের শিক্ষকদের এক-চতুর্থাংশ বেতনে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। আর আংশিক সময়ের শিক্ষকদের নামমাত্র টাকায় খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত নানা মহল থেকে বারবার দাবি উঠেছে, স্কুলে কর্মরত এইসব প্যারাটিচার ও আংশিক সময়ের শিক্ষকদের উপযুক্ত মর্যাদা ও বেতন সরকার থেকে দেওয়া হোক। কিন্তু কোনও সরকারই তাতে কর্ণপাত করেনি। তা হলে জেনেশুনেই সরকার এই বৈষম্য চলতে দিচ্ছে নাকি? উপরন্তু তৃণমূল সরকার এখন দুই-আড়াই হাজার টাকায় ইন্টার্ন নামক প্রায় বেগার তথা ঠিকা শিক্ষক নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছে। এই ভিক্ষাতুল্য টাকা শিক্ষকদের প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা।

আসলে সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। এমনিতেই সরকারি শিক্ষানীতির প্রভাবে রাজ্যে গরিব ও সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। অতি সাধারণ মানুষও ঘটিবাটি বিক্রি করে তাদের সন্তানদের ব্যয়বহুল বেসরকারি স্কুলগুলিতে ভর্তি করতে বাধ্য হচ্ছে। এরই মাঝে সরকারি যে স্কুলগুলি টিকে আছে ইন্টার্ন শিক্ষক নিয়োগের মধ্য দিয়ে সেগুলিকেও শেষ করে দেওয়া হবে। প্রাথমিকে দু'হাজার টাকা ও মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে আড়াই হাজার টাকা বেতনে যে শিক্ষকের জীবন অভাবে জর্জরিত হয়ে থাকবে তিনি কী করে উন্নত মানের শিক্ষা দেবেন? পশ্চিমবঙ্গের ন্যূনতম মজুরি আইনানুযায়ী সরকারিভাবে ২২৭ টাকা দৈনিক মজুরি অদক্ষদের জন্য বরাদ্দ। যদি ধরে নেওয়া হয় তাঁরা অদক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবেন তা হলে মাসে বেতন হওয়া উচিত ৬৮১০ টাকা। কী হিসাবে তাঁদের বেতন মাসে ২০০০ টাকা হয়? আসলে বিদ্যালয় স্তরে ইন্টার্ন নিয়োগ করার কথা বলে শিক্ষিত বেকারদের সামনে 'ভাল পড়ালে আগামী দিনে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক হওয়া যাবে' খুড়োর কলের মতো প্রতিশ্রুতি ঝুলিয়ে রেখে সামান্য অর্থ দিয়ে খাটিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে সরকার। অথচ ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন এবং রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ছাড়া শিক্ষক নিয়োগ অসম্ভব। এই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাজ্য সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। অথচ প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনার দাবিতে জনমত প্রবল হলেও এই সরকারই অজুহাত দিচ্ছে রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী কেন্দ্রের নির্দেশ ছাড়া রাজ্য পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনতে পারে না। একই আইনের দু'রকম ব্যাখ্যা কি রাজ্য সরকারের চরম দ্বিচারিতাকেই প্রকট করছে না!

এমনিতেই সাত বছর স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা হয়নি। এখন ইন্টার্ন নিয়োগের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পূর্ণ সময়ের শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়াটাকেই তুলে দেওয়া হবে, যাতে পরবর্তীকালে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্ন না ওঠে। রাজ্যে প্রায় ১ কোটি বেকার। গত ৮ বছরে কর্মসংস্থান তৈরি করতে ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে বেকার যুবকদের চাকরির প্রতীক্ষায় না থেকে তেলেভাজা বিক্রির পরামর্শ দিয়েছিলেন। মাত্র দু-তিন হাজার গ্রুপ ডি পদের জন্য ২৫-৩০ লক্ষ শিক্ষিত বেকার ফর্ম ফিল আপ করে। যার মধ্যে কেউ পিএইচডি, কেউ এমএ, এমএসসি সহ উচ্চ ডিগ্রিধারী। এখন স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে দলীয় আনুগত্যকে সামনে রেখে কলেজ ছাত্রদের ইন্টার্নশিপের লোভ দেখিয়ে দলদাস তৈরির পাকা বন্দোবস্ত করতে চাইছে সরকার। এর দ্বারা শিক্ষায় তৃণমূলের নগ্ন দলতন্ত্র কায়েম হবে। স্কুলশিক্ষার মান যতটুকু টিকে আছে তাও ভেঙে পড়বে। শিক্ষার মান আরও নামবে। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ লুপ্ত হবে। কারণ একই স্কুলে কিছু শিক্ষক সরকারি বেতন আর অধিকাংশ সামান্য অর্থের বিনিময়ে কাজ করবে। শিক্ষিত বেকারের দল ভিক্ষুক শিক্ষক হিসাবে চিহ্নিত হবে। শিক্ষাঙ্গনে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ থাকবে না, শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কে ফাটল ধরবে, যা স্কুলের পরিবেশকে নষ্ট করবে। সব মিলিয়ে স্কুল-শিক্ষার আরও সর্বনাশ ঘটবে।

এর ফলে অভিভাবকরা আরও বেশি করে তাঁদের সন্তানদের ব্যয়বহুল বেসরকারি বিদ্যালয়ে পাঠাতে বাধ্য হবেন। বেসরকারি স্কুলের ব্যবসা এই সুযোগে পুরোপুরি ফুলেফেঁপে উঠবে এবং শিক্ষা ক্রমশ পণ্যে পরিণত হবে ও সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাবে। তৈরি হবে দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সাধারণ গরিব-নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা।

রাজ্যের শিক্ষক শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবী অভিভাবক সহ শিক্ষাপ্রেমী সাধারণ মানুষ শিক্ষাক্ষেত্রে তৃণমূল সরকারের চরম নৈরাজ্য তৈরির এই প্রচেষ্টাকে মেনে নিতে পারেন না। তাঁরা অতি অবশ্যই প্রতিবাদে মুখর হবেন, প্রতিরোধে এগিয়ে আসবেন।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) হুগলি জেলার শ্রীরামপুর লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড আশুতোষ মাইতি দীর্ঘদিন ক্যান্সারে আক্রান্ত থেকে ৩০ ডিসেম্বর ৬৩ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিশোর বয়সে বাবাকে হারিয়ে

তাঁকে প্রবল দারিদ্রের মধ্যে চায়ের দোকানে কাজ করতে হয় সংসার প্রতিপালনের জন্য। ১৯৭৫ সালে তিনি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। পার্টির পত্রপত্রিকা, রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা, দোকানে চা খেতে আসা মানুষদের মধ্যে পার্টির কথা নিয়ে যাওয়ার শুরু তখন থেকেই। কমরেডদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল। সাধারণ মানুষ, গরিব, মধ্যবিত্ত যারাই তাঁর কাছে এসেছেন, সকলেই তাঁর ভালবাসা ও স্নেহের টান অনুভব করেছেন। দলের পত্রপত্রিকা বিক্রি, তহবিল সংগ্রহ সহ বহু ধরনের কাজ নিষ্ঠার সাথে করে গেছেন তিনি। পরবর্তীকালে সিএমডিএ-তে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী হিসাবে যোগ দেওয়ার পর সেখানকার কর্মচারীদের তিনি হয়ে উঠেছিলেন অত্যন্ত প্রিয়জন। কর্মচারী ইউনিয়ন পরিচালনার ক্ষেত্রে কমরেড মাইতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরিবারের সদস্যদের দলে যুক্ত ও ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত করে গেছেন। রোগের যন্ত্রণার মধ্যে বাড়ি থেকে বেরোতে না পারলেও দলের কর্মসূচির জন্য পোস্টার লিখে বাড়ির সামনের রাস্তার দেওয়ালে নিজের হাতে লাগাতেন।

১২ জানুয়ারি শ্রীরামপুর চাতরায় চন্দ্রসূর্য ভবনে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন হুগলি জেলা সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড পরিমল সেন। প্রয়াত কমরেডের ছবিতে মাল্যদান করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রশান্ত ঘটক। মুখ্য বক্তা ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য।

কমরেড আশুতোষ মাইতি লাল সেলাম

দায় কার

একের পাতার পর

পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণির পড়া বুঝতে পারে না। উত্তর-পূর্ব ভারতের অবস্থা আরও শোচনীয়। দেখা যাচ্ছে, যে রাজ্যের অর্থিক পরিস্থিতি যত খারাপ তাদের শিক্ষার মানও তত নেমেছে। বেসরকারি স্কুলগুলির ক্ষেত্রে এই মান সরকারি স্কুলের তুলনায় কিছুটা ভাল হলেও খুব আশানুরূপ নয়। এক্ষেত্রে একেবারে উচ্চস্তরের বেসরকারি স্কুলগুলির সাথে নিতান্ত সাধারণ মানের বেসরকারি স্কুলের তফাত আকাশ-পাতাল। এর ফলে গড়ে বেসরকারি স্কুলগুলির ৬১ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীর মান কিছুটা ভাল দেখালেও বাস্তবে সাধারণ বেসরকারি স্কুলের অবস্থা মোটেই ভাল নয়।

শুধু মান কমেছে তাই নয়, ৬ থেকে ১৪ বছরের যে শিশুদের স্কুলে ভর্তি সুনিশ্চিত করার কথা সরকার বলেছিল, তাদের ভর্তির হারও কমছে। ২০০৯-এ পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার পর রিপোর্ট বলছে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকারি স্কুলে ভর্তির হার ক্রমাগত কমে চলেছে। শিক্ষার অধিকার আইন, মিড-ডে মিল, সব স্কুলে শৌচাগার—এমন সব নানা প্রচারের পরেও এই হাল কেন? উত্তরটা কিন্তু সাধারণ মানুষ তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই পেয়েছেন। অথচ মুষ্টিমেয় একদল তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, খবরের কাগজের কলমচি এখনও তা ধরতে পারছেন না! এমনিতেই সরকারি স্কুলগুলি শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে। সরকারি হিসাবেই দেশের প্রায় ১ লক্ষ প্রাথমিক স্কুলে মাত্র ১ জন করে শিক্ষক। এর উপর স্কুলের ক্লার্কের কাজ, মিড-ডে মিল থেকে শুরু করে স্কুলের বাইরে সেন্সাস কিংবা ভোটার তালিকা তৈরি পর্যন্ত সব দায়িত্ব থাকে তাঁদেরই কাঁধে। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে লক্ষাধিক শিক্ষকপদ শূন্য সারা দেশেই। ফলে পড়ানো ব্যাপারটাই পিছনে চলে গেছে। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন কিংবা পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের বাড়তি পড়ানো তো অনেক দূরের কথা। এদিকে পাশ-ফেল প্রথা না থাকায় সরকারি স্কুলের ছাত্ররা কিছু শিখুক না শিখুক উঠে যাচ্ছে ধাপের পর ধাপ। দরিদ্র পরিবারগুলির পুরুষ-মহিলা উভয়কেই আজ কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হয়। কেউ ছোটে কাছের বড় শহরে, কেউ পাড়ি জমায় ভিনরাজ্যে। পরিবারেও ছেলেমেয়েদের পড়ার খোঁজ রাখবে কে? পাশ-ফেল প্রথা থাকলে তবু অভিভাবকরা কিছুটা খোঁজ খবর নিতেন। এখন ছেলে-মেয়ে তরতর করে ক্লাসের পর ক্লাস উঠে যাওয়ায় সে খোঁজের দরকারও তাঁরা বোধ করেন না। ছাত্র-ছাত্রীরাও আগের ক্লাসের পড়া কিছু না শিখেই পরের ক্লাসে উঠে যাওয়ায় নতুন পড়া কিছুই বুঝতে পারছে না। কিছুদিন স্কুলে বসে থেকে পড়াশোনায় আগ্রহই হারিয়ে ফেলছে। পরিবারের আর্থিক দুর্দশার কারণে কাজের খোঁজেই কোথাও মাথা গুঁজে দিচ্ছে। বাড়ছে ড্রপআউট। সব নামীদামি শিক্ষা পরিকল্পনার ওখানেই ইতি!

সরকারি স্কুলের যখন এই হাল সেই সুযোগে গ্রাম-মফস্বল থেকে শহরে বেড়েছে বেসরকারি স্কুলের রমরমা। একবারে গ্রামাঞ্চলেও নার্সারি থেকেই তার শুরু। একটু সংগতি থাকলেই এইসব বেসরকারি স্কুল আর কোচিং সেন্টারে সন্তানকে নিয়ে ছুটছেন বাবা-মায়েরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইসব স্কুলের বাইরের চাকচিক্য যত, ভিতরটা ততই ফাঁপা। পশ্চিমবঙ্গে এই বেসকারি স্কুলের রমরমা শুরু হয়েছিল সিপিএম সরকার প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার পর। ২০০৯ থেকে কেন্দ্রে কংগ্রেস, রাজ্যে তৃণমূল, আবার তারপরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার জেদ ধরে থাকার ফলে শিক্ষার ভিতটাই পুরো ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে। বিশেষত তথাকথিত শিক্ষার অধিকার আইনের পর তার ক্ষয় আরও দ্রুত বেড়েছে। মুষ্টিমেয় কিছু ব্যয়বহুল ভাল ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ছাড়া বাকি বেশিরভাগ স্কুলের পড়ার পরিবেশটাই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সুপরিকল্পিত এই চক্রান্তে।

এইরকম এক সর্বনাশা পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়েও কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি নানা অজুহাতে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যায় শিক্ষক নিয়োগ করার কাজে টালবাহানা করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও একই কাজ করছে। সব জেনেও তারা এমন টালবাহানা করে দেশের কয়েক কোটি ছাত্রছাত্রীর এমন সর্বনাশ চলতে দিচ্ছে। তা হলে কি বেসরকারি মালিকদের মদত দেওয়াই এর উদ্দেশ্য? এর স্পষ্ট জবাব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে দিতে হবে। এস ইউ সি আই (সি) দলের ধারাবাহিক আন্দোলন এবং জাগ্রত জনমতের চাপে তারা পাশ-ফেল চালুর কথা বলতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু মানুষ আর কালক্ষেপ করতে দিতে রাজি নয়। হয় সরকার এখনই ঘোষণা করুক প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল ফিরবে। না হলে মানুষ তা আদায় করবে আন্দোলনের মাধ্যমেই।

‘আয়ুষ্মান ভারত’ ঃ রোগীরা নয়, স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীরাই লাভবান হবে

‘আয়ুষ্মান ভারত’ যোজনা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য বাগযুদ্ধ শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দলবাজি করছেন— এই অভিযোগ তুলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি এই প্রকল্প রূপায়ণ থেকে সরে এসেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রচার করছে, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা থেকে রাজ্যবাসীকে বঞ্চিত করছে তৃণমূল সরকার। তৃণমূলের বক্তব্য, রাজ্য সরকারের ‘স্বাস্থ্য সাথী’ প্রকল্পের মধ্য দিয়েই তারা সাধারণ মানুষের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেবেন।

যদিও চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিমত, ২০০৮ সালে কংগ্রেস সরকারের রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (আর এস বি ওয়াই), তৃণমূলের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প বা বিজেপির আয়ুষ্মান ভারত যোজনা— সবগুলিই একই প্রকল্পের ভিন্ন ভিন্ন নাম। সবগুলিরই মূল কথা হল স্বাস্থ্য হবে বিমা নির্ভর— যেখানে বিমার প্রিমিয়ামের একাংশ দিতে হবে সাধারণ মানুষকে, বাকিটা দেবে কেন্দ্র ও রাজ্য ৬০ ঃ ৪০ অনুপাতে।

‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্পকে বিজেপি নাম দিয়েছে ‘মোদি কেয়ার’। সরকারের বক্তব্য, এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ২০২২ সালের মধ্যে এক নতুন ভারত গড়ে তোলা হবে। কীভাবে? ভারতের হত দরিদ্র এবং স্বাস্থ্য বঞ্চিত ১০ কোটির বেশি পরিবারকে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। চিকিৎসা হবে বিমার মাধ্যমে। এ জন্য সরকার বরাদ্দ করেছে ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের জন্য ১০,৫০০ কোটি টাকা। ১০ কোটি পরিবারের জনসংখ্যা ৫০ কোটি ধরলে, মাথাপিছু বরাদ্দ হয় মাত্র ২১০ টাকা। এই টাকায় কি কোনও চিকিৎসা হতে পারে? টাকা বরাদ্দের বহর দেখেই বোঝা যায়, সরকার কেমন নতুন ভারত গড়তে চায়!

প্রকল্পে আরও বলা হয়েছে, চিকিৎসা পরিষেবা দেশময় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ১ লাখ ৫০ হাজার ‘হেলথ ওয়েলনেস সেন্টার’ গড়া হবে। এ ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয়েছে কত? মাত্র ১২০০ কোটি টাকা। কেন্দ্র প্রতি বরাদ্দ মাত্র ৮০ হাজার টাকা। এই টাকায় একটা পরিপূর্ণ ওয়েলনেস সেন্টার গড়ে তোলা কি সম্ভব? এই টাকায় বড়জোর শিলান্যাস হতে পারে বা সেন্টারের দু’চারটে পিলার হতে পারে। তা দেখিয়ে ভোটের হাওয়া গরম করা যেতে পারে, চিকিৎসা কি সম্ভব?

সরকার যদি সত্যিই গরিবের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চায় তা হলে হাসাপাতালেই তো বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং দ্রুত চিকিৎসা পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারত। তা না করে বিমা কেন? সরকার যদি সত্যিই মনে করে, স্বাস্থ্য হবে সকলের অধিকার, তা হলে সেই অধিকার পাওয়ার সামনে সকল বাধাগুলি সরকারকে দূর করতে হবে। বিশেষ করে ‘টাকা যার চিকিৎসা তার’— এই যে পরিস্থিতি বিভিন্ন সরকারের হাত ধরে তৈরি হয়েছে তা দূর করতে হবে। এজন্য চিকিৎসার সমস্ত খরচ সরকারকে বহন করতে হবে। তা না করে সরকার বিমা নির্ভর চিকিৎসা আনতে চাইছে কেন? বিমা মানেই তো বিনামূল্যে চিকিৎসার অধিকারকে অস্বীকার করা। আসলে সরকার কিছু মানুষের বিমার কিছু প্রিমিয়াম বহন করে বাস্তবে বিনামূল্যে চিকিৎসার অধিকারই হরণ করছে। এতবড় একটা প্রতরণা আড়াল করতেই সরকার গরিব দরদের বাহানা তুলছে।

এই বিমার সুবিধা পেতে গেলে হাসপাতালে রোগীকে ভর্তি হতে হবে। তথ্য বলছে, হাসপাতালের আউটডোরে যত বড় লাইন বা ভিড় থাকুক, হাসপাতালে ভর্তি হন ৪ শতাংশেরও কম মানুষ। বাকিদের চিকিৎসা চলে আউটডোর থেকেই। তাতে খরচ যতই রোগ বিমা মিলবে না। আবার বিমা আছে বলে সরকারও হাত গুটিয়ে নেবে। আবার যে কোনও রোগ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেই বিমায় চিকিৎসা মিলবে না।

কারণ বিমায় সবধরনের চিকিৎসাও হয় না। বিশেষ বিশেষ কিছু রোগ বিমা নির্ভর চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই বিমা করলেই সুরাহা মিলবে এ কথা সত্য নয়। তা ছাড়া বিমার সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে নানা সমস্যা, রয়েছে দুর্নীতি— যা আরএসবিওয়াইয়ের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। চিকিৎসা সহজলভ্য করতে হলে জরুরি ছিল নিখরচায় হাসপাতালে দ্রুত চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা, পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাক্তার, নার্স, চতুর্থ শ্রেণির কর্মী থেকে নিয়োগ শুরু করে অত্যাধুনিক সব রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা চালু রাখা। সরকার এ দিকটা অবহেলা করে বিমার বাদ্যি বাজাচ্ছে কাদের স্বার্থে?

আরএসবিওয়াইয়ের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিমা করা রোগীদের সিংহভাগ পরিষেবা দিয়েছে বেসরকারি নার্সিং হোম। বিমাতে তারাই পরিষেবা বেচে মুনাফা তুলেছে। সেই কারণে আয়ুষ্মান প্রকল্প ঘোষিত হতেই নার্সিং হোম ব্যবসায়ীরা উল্লসিত। এদের স্বার্থ সুরক্ষাই আয়ুষ্মানের মূল উদ্দেশ্য।

চিকিৎসার খরচ নিয়ে ছোট-বড় যে গবেষণাগুলি হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, সরকারি স্বাস্থ্য বিমার আওতায় থাকা পরিবারদের মধ্যেও চিকিৎসার বার্ষিক খরচ তেমন কিছু কমেনি। কারণ সাধারণ অসুখ-বিসুখ যা বারবার হয় তার চিকিৎসা খরচ বেড়ে বহুগুণ বেড়েছে। বেড়ে চলেছে ওষুধপত্রের ঊর্ধ্বমুখী দাম। ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশনের হিসাবে রোগীদের চিকিৎসায় এখন আগের চেয়ে প্রায় ৩০০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সিইও ইন্দুভূষণ সম্প্রতি বলেছেন, চিকিৎসার বোঝা বইতে গিয়ে ভারতে প্রায় প্রতি বছর নতুন করে ৬ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে চলে যাচ্ছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করতে কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, চিকিৎসার অত্যধিক খরচ কমাতেই বিমা চালু করা হচ্ছে। অথচ বাস্তব বলছে বিমা সত্ত্বেও চিকিৎসার খরচ বাড়ছে।

সত্যিই চিকিৎসার খরচ কমাতে হলে আয়ুষ্মানের ধোঁকা নয়, বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়েই একমাত্র তা সম্ভব।

রাফাল বনাম অগুস্তা

দুর্নীতির প্রতিযোগিতায় বিজেপি ও কংগ্রেস

রাফাল কেলেঙ্কারিতে নাজেহাল প্রধানমন্ত্রী সংসদ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁর পারিষদ-মন্ত্রীরা স্পষ্ট উত্তরের বদলে নাটকীয় ভঙ্গিতে কিছু আবেগপূর্ণ কথার মারপ্যাঁচে আসল বিষয় এড়িয়ে যেতে মরিয়া। ঠিক এই সময় কেন্দ্রীয় সরকার ক্রিশ্চিয়ান মিশেল নামে এক ব্যক্তিকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে ধরে নিয়ে এসে প্রবল দুর্নীতি বিরোধিতার ভান করছেন। এই ব্যক্তি বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে এ দেশে ভি ভি আই পি-দের জন্য হেলিকপ্টার বিক্রির বরাত পেতে অগুস্তা ওয়েস্টল্যান্ড কপ্টার কোম্পানির হয়ে দালালি করেছিলেন। আশ্চর্য সমাপতন, এই মিশেল নাকি ঠিক এই সময় কপ্টার কাণ্ডে ‘মিসেস গান্ধী’ এবং ‘ইতালীয় মহিলার ছেলে’ ‘বিগ ম্যান আর’-এর নাম নিয়েছেন! শুনেছে কে? কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা এনফোরসমেন্ট ডাইরেক্টরেট বা ইডি-অফিসাররাই একমাত্র শ্রোতা। ফলে জমে উঠেছে তরজা। কে বড় দুর্নীতিগ্রস্ত, বিজেপি না কংগ্রেস? এই নিয়ে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন একেবারে সরগরম হয়ে উঠেছিল।

সামনেই লোকসভা নির্বাচন, ঠিক তার আগে বিশেষত একেবারে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ধাক্কা খাওয়ার পর এই ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ২০১৪-র ভোটের আগে করপোরেট মিডিয়ার ফলাও প্রচার নরেন্দ্র মোদিকে ঘিরে যে ‘মিথ’-এর জন্ম দিয়েছিল পাঁচ বছরের ব্যবধানে আজ তা সম্পূর্ণ মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। নোটবন্দি-জিএসটির আঘাত, ভয়াবহ বেকারি, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, কৃষক অসন্তোষ, মন্ত্রী-নেতাদের মদতে ব্যাঙ্ক-লুঠেরাদের বিদেশে পাড়ি, শিল্পপতি আম্বানি ও বিজেপি নেতাদের পকেট ভরাতে রাফালের কেলেঙ্কারির মতো নানা ঘটনা জনমানসকে এতটাই তিক্ত ও আলোড়িত করেছে যে উগ্র হিন্দুত্বের বিষ ছড়িয়েও তাকে মোকাবিলা করতে পারেনি বিজেপি।

মিশেলকে হাতিয়ার করে বিজেপির চেষ্টা কংগ্রেসও যে দুর্নীতিগ্রস্ত তা দেখিয়ে নিজের দুর্নীতির অভিযোগকে কিছুটা হালকা করে দেওয়া। মিশেল-অস্ত্রে কংগ্রেস কতটা কাত হবে সেটা ভবিষ্যতই বলবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, অগুস্তা-কপ্টার কাণ্ডে বিগত কংগ্রেস সরকার যে নিজেদের এবং টাটাদের পকেট ভরানোর ব্যবস্থা করেছে, সে কথা গত পাঁচ বছরে নরেন্দ্র মোদিদের মনে পড়ল না কেন? ২০১৪-তে এ দেশের একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের আশীর্বাদ একজোট হয়ে গিয়েছিল বিজেপির ঝুলিতে। কংগ্রেসকে প্যাঁচে ফেলতে গিয়ে বৃহৎ করপোরেট মালিক টাটাদের চটানোর ইচ্ছা সেই সময় বিজেপির ছিল না বলেই কি? কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টেছে। করপোরেটের আশীর্বাদী সাদা-কালো টাকার নৈবেদ্য ভাগ হয়ে যাচ্ছে। একতরফা বিজেপির প্রতি তাদের সমর্থন যে থাকছে না সাম্প্রতিক ভোটের ফল আর প্রচারমাধ্যমে চোখ রাখলেই তা বোঝা যায়। একই সাথে বাড়ছে বিজেপির বিরুদ্ধে জনরোষ আছড়ে পড়ার আশঙ্কাও। ফলে করপোরেট মালিকদের বেশ বড় অংশ প্রায় ডুবতে বসা কংগ্রেসকে আবার ভাসিয়ে তুলে জনগণের ত্রাতা হিসাবে সাজাতে তৎপর। তাদের আশীর্বাদে কংগ্রেসও অনিল আম্বানির মতো ধনকুবেরদের বিরুদ্ধে পর্যন্ত গরম গরম কথা বলে জনগণকে একেবারে মোহিত করে দেওয়ার চেষ্টায় রত। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ বিজেপির মনে পড়ে গেছে অগুস্তা হেলিকপ্টার কেলেঙ্কারির কথা।

বিজেপি লড়বে দুর্নীতির বিরুদ্ধে! তাহলে ২০১৪ সালে ক্ষমতায় বসার তিন মাসের মধ্যে তারা ঘুষ দেওয়ায় অভিযুক্ত অগুস্তা ওয়েস্টল্যান্ড এবং তার সহযোগী ফিনমেকেনিকো-র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল কেন? আসলে ঘটনা এটাই, দুর্নীতি ঠেকানোর জন্য কংগ্রেস, বিজেপি কারওরই মাথাব্যথা নেই। দুর্নীতি এদের হাতে এমন একটি তাস যা তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কাজে ব্যবহার করতেই বেশি আগ্রহী। আর কিছু নয়।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেস বা বিজেপি যতই গলাবাজি করুক, এদের প্রত্যেকেরই গায়ে লেগে রয়েছে দুর্নীতির অজস্র কালো দাগ। এদের কেউ অভিযুক্ত বফর্স কেলেঙ্কারি, ট্রেজারি কেলেঙ্কারিতে, আবার কেউ অভিযুক্ত জমি কেলেঙ্কারি, কফিন কেলেঙ্কারিতে। এ রকম হাজার একটা কেলেঙ্কারির এরা নায়ক। প্রত্যেকটি কেলেঙ্কারি থেকে লাভবান হয় কোনও না কোনও পুঁজিপতি গোষ্ঠী। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা সরকারি ভাণ্ডারের অর্থ পুঁজিপতিদের সেবায় বিলিয়ে দেওয়া বা কাটমানির খেলায় এরা কেউ কারও থেকে পিছিয়ে নেই। বস্তুত, ভোটসর্বস্ব রাজনীতির এটাই বৈশিষ্ট্য। যারাই শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির প্রসাদ ও আনুকূল্যে রাজনৈতিক মঞ্চে টিকে থাকতে চায়, শাসক-শোষক শ্রেণির কাছে আত্মবিক্রয় করে নিজেদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস হয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষাই যাদের একমাত্র কাজ, তাদের রাজনীতি দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত হতে বাধ্য।

আজকের পরিষদীয় রাজনীতি প্রধানত যে দুই দলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে, সেই কংগ্রেস ও বিজেপির আজ আর দেশের মানুষকে কিছু দেওয়ার নেই। এটাই জনগণের জীবনের নির্মম অভিজ্ঞতা। অথচ ভোট এলে তার আবর্তে পড়ে সাধারণ মানুষ এসব কথা ভুলে যায়। তাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়। ভুলিয়ে দেয় করপোরেট মিডিয়ার অবিশ্রান্ত প্রচার। পুঁজিপতি শ্রেণি জনগণের সামনে হাজির করে সেই দুই পক্ষকে— যারা তাদের পরিকল্পিত, তাদেরই মদতপুষ্ট দ্বি-দলীয় পরিষদীয় ব্যবস্থার দুই প্রধান শরিক। বলা হয়, বেছে নাও এদের কাকে চাও। যেন এদের বাইরে আর কেউ নেই। আবার এদের মধ্যে যাকে পুঁজিপতি শ্রেণি ক্ষমতায় আনতে চায়, তার দিকে প্রচারের পাল্লা ভারী থাকে। জনগণ না-বুঝে তাদের পাতা ফাঁদে পা দেয়। এ ভাবেই জনগণ ঠকে, আর ওরা জেতে। ভোটে জেতে দল, মানুষ জেতে লড়াইয়ের ময়দানে। এই সত্যকে ভুলে গেলে ঠকতেই হবে।

নদিয়া জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ

প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু, চাষির ফসলের ন্যায্য দাম, সারে ভরতুকি, কৃষি ঋণ মকুব, মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা, কৃষ্ণনগর-করিমপুর রেল যোগাযোগ স্থাপন, কৃষ্ণনগরের বেলেডাঙা রেলগেটে ফ্লাইওভার নির্মাণ সহ ১০ দফা দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) নদিয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস কমল দত্ত, হররোজ আলি সেখ, অপর্ণা গুহ ও মহিউদ্দিন মণ্ডল। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস মসিকুর রহমান, প্রবীর দে, জয়দীপ চৌধুরী প্রমুখ।

বৈদিক শিক্ষার নামে আধুনিক শিক্ষাকে পিছন দিকে ঠেলে দেওয়ার অপপ্রয়াস

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ১১ জানুয়ারি ঘোষণা করেছেন, তাঁরা বেদ শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার মেল বন্ধন ঘটানোর উদ্দেশ্যে একটি ভারতীয় শিক্ষা বোর্ড তৈরি করবেন। অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বোর্ডের মতো এটি একটি স্কুল শিক্ষার বোর্ড হিসাবে কাজ করবে যাতে বেদ ও সংস্কৃত শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হবে। স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক শিক্ষা থাকবে পিছনের সারিতে। অধ্যাপক সংহতি মঞ্চ-র উদ্যোগে ১২ জানুয়ারি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় ওই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। বলা হয়, এই পদক্ষেপ বিজেপি সরকারের গৈরিকীকরণ চক্রান্তের অংশ। উচ্চশিক্ষায় অবাধ বাণিজ্যিকীকরণ, গৈরিকীকরণ, কেন্দ্রীকরণের প্রতিবাদে এবং স্বাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষ-বৈজ্ঞানিক-গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবিতে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, অধ্যাপক অশোকেন্দু সেনগুপ্ত, অধ্যক্ষ নীলেশ মাইতি, অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন প্রধান সমেত রাজ্যের বহু কলেজের অধ্যাপকরা।

প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক গৌতম মাইতি এবং সমগ্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন আই আই এস ই আর-কলকাতার অধ্যাপক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সৌমিত্র ব্যানার্জী। সভাপতিত্ব করেন মঞ্চের কনভেনর অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর।

বাসে কনসেশনের দাবিতে ছাত্র মিছিল

ছাত্রদের বাসভাড়া এক-তৃতীয়াংশ করার দাবিতে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্ররা ১৯ জানুয়ারি শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে মিছিল করে কোর্টমোড়, ভেনাসমোড়, এয়ারভিউ জংশন হয়ে এসডিও দপ্তরে এবং এনবিএসটিসি দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়। ডিএসও-র দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষে নেতৃত্ব দেন ডাঃ অপূর্ব মণ্ডল, ডাঃ দেবেন্দ্র প্রসাদ মহন্ত, কমরেড কল্লোল বাগচী, রিনা মণ্ডল প্রমুখ। এসডিও শীঘ্রই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

সারের কালোবাজারি বন্ধের দাবিতে নওদায় কৃষক বিক্ষোভ

মুর্শিদাবাদের নওদা ব্লকের আমতলা, বালি, টুঙ্গি, ত্রিমোহিনী, পাটিকাবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় সারের বস্তা পিছু দুশো-তিনশো টাকা বেশি নেওয়া হচ্ছে। চলতি বছরে কম বৃষ্টি এবং অকাল বৃষ্টিতে অনেক ফসল নষ্ট হয়েছে। চাষিদের দাবি, সারের কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিক। এ ছাড়া আধার কার্ডের মাধ্যমে সার বিক্রি না হওয়ায় চাষিরা ভুর্তকি পাচ্ছেন না। এই সমস্যাগুলির প্রতিকারের দাবিতে চাষি বাঁচাও কমিটির সদস্যরা ১১ জানুয়ারি স্থানীয় বি ডি ও অফিসে ডেপুটেশন দেন। বিডিও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

নতুন ট্রেন চালুর দাবিতে তুফানগঞ্জে এস ইউ সি আই (সি)-র ডেপুটেশন

মাত্র কয়েক বছর আগে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙা, মেখলিগঞ্জ প্রভৃতি মহকুমা রেল পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু রেল লাইন স্থাপিত হলেও ট্রেনের সংখ্যা খুবই কম। আসামের নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে একটি ডি এম ইউ ট্রেন তুফানগঞ্জ হয়ে শিলিগুড়ি পৌঁছাত। বর্তমানে ট্রেনটির রুট পাল্টে দেওয়ায় প্রায় তিনঘণ্টা বেশি সময়ে লাগছে।

ট্রেনটি পুরনো রুটেই চালাবার দাবি তুলেছে এস ইউ সি আই (সি)। অবিলম্বে আরও নতুন লোকাল ট্রেন চালু, গৌহাটি-শিয়ালদহ ভায়া তুফানগঞ্জ এবং গৌহাটি-হাওড়া ভায়া তুফানগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর দাবিতে এবং স্টেশনে পরিশ্রুত পানীয় জল, পরিচ্ছন্ন শৌচাগার এবং অসংরক্ষিত-সংরক্ষিত টিকিট কাউন্টার প্রতিদিন খোলা রাখার দাবিতে ১৫ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) তুফানগঞ্জ লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে স্টেশন সুপারিনটেনডেন্টকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড সান্ত্বনা দত্ত, প্রাক্তন সাংসদ ও বিধায়ক কমরেড দেবেন্দ্রনাথ বর্মন, কমরেডস আব্দুস সালাম, রবিয়া সরকার প্রমুখ।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে উপেক্ষিত হল চটকল শ্রমিকদের দাবি

১৭ জানুয়ারি চটশিল্পের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক নতুন নিয়োগ হওয়া শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি ৭০ টাকা ঘোষণা করেন। এর ফলে কেবলমাত্র নতুন নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি ২৫৭ টাকা থেকে বেড়ে ৩২৭ টাকা হলেও পুরনো শ্রমিকদের মজুরির চাইতে প্রায় ১৫০ টাকা কম থেকে গেল।

এর দ্বারা বাস্তবে সমস্ত চটকল শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিটি উপেক্ষিত হল এবং সাধারণভাবে সমস্ত শ্রমিকদের কোনও মজুরি বৃদ্ধি হল না। এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড অমল সেন, এই অন্তবর্তীকালীন মজুরি বৃদ্ধির তীব্র বিরোধিতা করে সমস্ত শ্রমিকদের ১৮,০০০ টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবি জানান। এ ছাড়াও সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নগুলির যৌথভাবে পেশ করা দাবি সনদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি— যেমন ৯০ শতাংশ পার্মানেন্ট এবং ২০ শতাংশ স্পেশাল বদলি রাখা, শ্রমিকদের অনাদায়ী গ্র্যাচুইটি প্রদান, কাজের প্রথম দিন থেকেই শ্রমিকদের পি এফ এবং ই এস আই-এর সুবিধা চালু করা এবং কন্ট্রাক্ট প্রথা বাতিল করা প্রভৃতির কোনও মীমাংসা হয়নি।

শ্রমমন্ত্রী এই দাবিগুলি নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করে মীমাংসা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

গ্রামবাসীরা নামছেন মদ রুখতে আন্দোলন জেলায় জেলায়

১৬ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক ব্লকের পিপুলবেড়িয়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে বহিচাড় গ্রামে একটি মদের ঠেক ভেঙে দিলেন গ্রামবাসীরা। ওই দিন ভোর বেলায় গ্রামের শতাধিক মহিলা জড়ো হয়ে এক মদ বিক্রেতার মদের ভাটি ভেঙে দেন। মদ পুড়িয়ে দেন তাঁরা।

এলাকায় মূলত গরিব মানুষের বাস। মহিলাদের অভিযোগ, তাঁদের স্বামীরা মদ খেয়ে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করে। যতটুকু আয় করেন, মদে প্রায় সবটাই খরচ করে ফেলেন। প্রশাসনকে জানানোর পরেও কোনও সুরাহা না হওয়ায় জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই মদের ঠেকটি ভেঙে দেন। নেতৃত্ব দেন, প্রতিমা জানা, তনুশ্রী মাইতি, মামণি দাস, অনু মান্না, চম্পা মান্না, শ্রাবণী মান্না প্রমুখ। মহিলারা এরপর অন্যান্য জায়গায় মদের ঠেক হলে তা ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এলাকায় কমিটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে এম এস এস।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডিতেও মহিলারা মদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন।

সুদানে প্রবল গণবিক্ষোভ

প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশিরের পদত্যাগের দাবিতে গত ডিসেম্বর থেকে সুদানে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। ৯ জানুয়ারি রাজধানী খার্টুমে সেই বিক্ষোভ তীব্রতম রূপ নেয়। রাজধানী লাগোয়া

ওমডারমান শহরে এদিন পুলিশের গুলিতে তিনজন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়। আহত হন বেশ কয়েকজন। বিক্ষোভে এখনও পর্যন্ত ৪০ জনেরও বেশি বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছে।

২৯ বছর ধরে প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন আল-বশির। ১৯৮৯ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতায় বসেন তিনি। আফ্রিকা মহাদেশের একসময়কার বৃহত্তম দেশ সুদান অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এখন চূড়ান্ত দুরবস্থায়। ২০১১ সালে আলাদা দেশ হিসাবে দক্ষিণ সুদান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর থেকে সুদানের অর্থনৈতিক দুর্দশা বেড়েছে, কারণ দেশের তেল সম্পদের চারভাগের তিনভাগই চলে গেছে দক্ষিণ সুদানে। আল-বশির এই দুরবস্থা শুধু সামাল দিতে পারছেন না তাই নয়, নানা ধর্ম ও জাতিতে বিভক্ত দেশটির মধ্যে শান্তি বজায় রাখার কাজেও তিনি ব্যর্থ। দেশে বেকার সমস্যা ভয়াবহ, জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। এর ওপর রুটিতে আর সরকারি ভরতুকি পাওয়া যাবে না, এমন আশঙ্কা তৈরি হওয়া ক্ষোভে ফেটে পড়ে সুদানের মানুষ। ১৯ ডিসেম্বর পথে নামে তারা। সেই থেকে লাগাতার বিক্ষোভ চলছে সুদান জুড়ে।

৯ জানুয়ারি প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবিতে মুখর সুদানের বিক্ষোভরত কয়েক হাজার মানুষ পার্লামেন্টের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে, গুলি চালিয়ে তাদের বাধা দেয়। এ দিন বিক্ষোভকারীদের সংগ্রামী মেজাজ ছিল তুঙ্গে। সন্ধ্যা নেমে যাওয়ার পরেও বিক্ষোভ থামেনি। পুলিশের তাড়া খেয়ে বার বার রাজপথ ছেড়ে আশপাশের রাস্তায় চলে যেতে হয়েছে বিক্ষোভকারীদের, কিন্তু পরক্ষণেই আবার দল বেঁধে পার্লামেন্ট ভবনের দিকে অভিযান চালিয়েছে তারা।

এক তরুণীর কথায় ফুটে উঠেছে সুদানের মানুষের দুরবস্থার ছবি। উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত কাজ না পেয়ে সে কয়েকটি অফিসে ঝাড়পোঁছের কাজ করে। মেয়েটি জানিয়েছে, "প্রেসিডেন্টকে গদি ছাড়তেই হবে, কারণ আমাদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। সমস্ত ভয় আর দ্বিধা ছেড়ে এই প্রথমবার আমি বেরিয়ে এসে প্রতিবাদে যোগ দিয়েছি। এছাড়া বাঁচার আর কোনও উপায় নেই।"

দীর্ঘদিন যাবৎ সুদানের অশান্ত পরিস্থিতি দেশের মানুষকে মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে আজ পথে নামিয়েছে।

অবিভক্ত সুদান ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীন। ১৯৫৬ সালে স্বাধীন হওয়ার পর থেকে সুদানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বার বার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে নানা ঘটনায়। স্বাধীন হওয়ার বছর খানেক আগে থেকে দক্ষিণ সুদানের বিদ্রোহীরা হাতে অস্ত্র তুলে নেয়, শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। ১৯৫৮ সালে সদ্যস্বাধীন সুদানে ক্ষমতা দখল করে সামরিক বাহিনী। ছ'বছর ধরে শাসন কায়েম রাখে তারা। ১৯৬৪ সালে নির্বাচন হয়। একের পর এক সরকার গঠিত হয়, কিন্তু কেউই গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে পারেনি। ১৯৬৯ সালে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতায় বসেন সেনা-অফিসার জাফর আল-নিমেইরি। এরপর সামরিক বাহিনীই ১৯৮৫ সালে আল-নিমেইরিকে হঠিয়ে একটি নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতায় বসায়। এর চার বছর পরে ইসলামি মৌলবাদীদের ঘনিষ্ঠ সেনা অফিসার আল-বশির অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সুদানের প্রেসিডেন্ট পদ দখল করেন।

২৯ বছর ধরে আল-বশিরের শাসনে দেশের মানুষকে ব্যাপক নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। একদিকে ইসলামি ভাবাদর্শের নাম করে তিনি একটি অনুগত মিলিশিয়া বাহিনী তৈরি করেছেন, যা তাঁর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে জোরদার করেছে। অন্যদিকে নানা কৌশলে প্রতিবেশী দেশগুলির কোনওটির সঙ্গে হৃদ্যতা তৈরি করে, কোনওটির বিরুদ্ধে গিয়ে, কখনও একটি দেশকে অন্য দেশের বিরুদ্ধে উসকে দিয়ে সুবিধা আদায় করে নিয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায় দেশের মধ্যে ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতাদের একটি অনুগত চক্র গড়ে তুলেছেন যাদের হাতে জমা হয়েছে ব্যাপক সম্পদ ও ক্ষমতা। ক্রমাগত আরও বেশি করে শোষিত লুণ্ঠিত হয়েছে দেশের সাধারণ মানুষ।

বাড়তে থাকা দুর্দশা সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে এর আগেও বার বার প্রেসিডেন্ট আল-বশিরের বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছে সুদানের সাধারণ মানুষ। বার বারই বিক্ষোভকারীদের হত্যা করে, বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করে, শহরে শহরে কারফিউ কিংবা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বন্ধ করে দিয়ে বিরোধী কণ্ঠের টুঁটি টিপে ধরেছেন তিনি। কিন্তু পেট বড় বালাই। তাই আবারও গত ডিসেম্বর থেকে বিক্ষোভের পথে সুদানের জনতা।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তুঘলকি আচরণের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের জয়

১৪ জানুয়ারি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলির তৃতীয় বর্ষের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট রাত দশটা পর্যন্ত অবরোধ করে রাখল। বিশাল পুলিশবাহিনী নামিয়েও আন্দোলন দমন করতে পারল না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে ১১ জানুয়ারি আচমকা তৃতীয় বর্ষের লিখিত পরীক্ষার দিন ঘোষণা করা হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে। তারও অনেক আগে থেকে প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষা হবে। যা শিক্ষাবর্ষের নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় দু'মাস আগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে খবরটা দেখার পরে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সকলেই হতবাক হয়ে পড়েন। কারণ বেশিরভাগ কলেজে সিলেবাসই শেষ হয়নি। কেবলমাত্র নির্বাচনের কারণে সিলেবাস শেষ হওয়ার আগেই পরীক্ষা দিতে হবে ছাত্রছাত্রীদের! ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে ছাত্ররা। ছাত্র সংগঠন

এআইডিএসও প্রথম থেকেই বিক্ষোভকে সংগঠিত প্রতিবাদের রূপ দিতে সক্রিয় হয় এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সিদ্ধান্ত নেয় ১৪ জানুয়ারি তারা একত্রিত হয়ে উপাচার্যের সাথে দেখা করতে যাবে। ওই দিন সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছায় এবং তাদের প্রতিনিধিরা উপাচার্যের সাথে দেখা করতে চায়। অনুমতি না দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি গেটই অবরোধ করে বসে থাকে তারা। স্লোগান ওঠে, সিলেবাস শেষ না করে পরীক্ষা নেওয়া চলবে না। ছাত্রদের অনমনীয় মনোভাব দেখে কর্তৃপক্ষ আন্দোলন ভাঙতে ছাত্র ইউনিয়নের টিএমসিপির মস্তান বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। ক্যাম্পাসের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার নামে র‍্যাফ নামায়। ছাত্রীদের মনোবল ভাঙতে অশ্লীল আচরণ করতে থাকে। তবু ছাত্রছাত্রীদের একবিন্দু টলানো যায়নি। কলেজ হোস্টেলগুলি থেকে খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আন্দোলনরত বন্ধুদের পাশে দাঁড়াতে থাকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা।

প্রবল শীতে রাত পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের এই অটুট মনোভাবের কাছে একযোগে নতিস্বীকার করতে হয় টিএমসিপি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ বাহিনীকে। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে মার্চের শেষ সপ্তাহে তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা শুরু হবে। সমস্ত প্রতিকূল শক্তির সাথে লড়াই করে জয় হয় আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের। এআইডিএসও-র পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড অনুপ মাইতি ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড ব্রতীন দাস যৌথ বিবৃতিতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের এই আন্দোলনকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের উপর টিএমসিপি-র ঘৃণ্য আক্রমণ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতার প্রতিবাদে ১৬ জানুয়ারি দুই জেলা জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

দিল্লিতে গবেষকদের আন্দোলনে পুলিশি হামলা ডি আর এস ও-র নিন্দা

হাজার হাজার গবেষক ১৬ জানুয়ারি যখন তাঁদের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবিতে দিল্লিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, তখন পুলিশ তাঁদের উপর হামলা চালায় এবং গ্রেপ্তার করে। তাঁদের দাবি— উচ্চশিক্ষার বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি, গবেষকদের ফেলোশিপ বৃদ্ধি এবং তা প্রতি মাসে নিয়মিত প্রদান, ফি-কমানো প্রভৃতি। দাবিগুলি মেনে নিয়েও কর্তৃপক্ষ নানা অজুহাতে গত পাঁচ বছর ধরে তা কার্যকর করছে না। তাই তাঁরা তাঁদের গবেষণাগার ছেড়ে পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। এই ঘটনা শুধু গবেষকদের উপর আঘাত নয়, তাঁরা মনে করেন, এ আক্রমণ শিক্ষা, গবেষণা ও দেশের অগ্রগতির উপর।

ডেমোক্রেটিক রিসার্চ স্কলারস অর্গানাইজেশন এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে অবিলম্বে ন্যায্য দাবিগুলি মেনে নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করেছে।

কলকাতা বইমেলায়
গণদাবী
স্টল নং ১৬৮

উলট পুরাণ

বিজেপির মুখে হঠাৎ বহুজাতিক বিরোধিতা

‘বানরে সঙ্গীত গায়, শিলা জলে ভেসে যায়/ দেখিলেও না হয় প্রত্যয়...!’

অনলাইন কেনাকাটার জগতের দৈত্যাকার বহুজাতিক সংস্থা অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট প্রভৃতিদের দেওয়া বিপুল ছাড়ের প্রতিশ্রুতি, এমনকী দ্রুত ডেলিভারির প্রতিশ্রুতির ওপরেও নিষেধাজ্ঞা আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এমন কথা শুনলে আশ্চর্য না হয়ে উপায় আছে! কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির রামনাম করেই উত্থান এবং ভোটের সাধনায় সিদ্ধিলাভ, তা না হলে একে ভুতের মুখে রাম নামও বলা চলত। মাত্র কিছুদিন আগেই খুচরো ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে কেন্দ্রীয় সরকারের উৎসাহদানের নীতি ঘোষণা করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তার বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে উত্তাল প্রতিবাদ উঠেছিল। ছোট ব্যবসায়ী সহ জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মত ছিল যে, এর ফলে দেশের ছোট ব্যবসায়ীকুল প্রবল অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম হবে। কিন্তু সরকার এবং কর্পোরেটে পুঁজিমালিকদের বক্তব্য ছিল, এর ফলে এ দেশের ব্যবসায়িক পরিষেবা আরও উন্নত হবে। ক্রেতা সাধারণও আন্তর্জাতিক মানের পণ্যদ্রব্য ঘরে বসে কেনাকাটার সুযোগ পাবেন। কয়েক বছর যেতে না যেতেই এখন তাঁরা এই বলে উল্টো গাইছেন যে, অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক প্রতিযোগিতায় পড়ে এ দেশের ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের নতুন নীতিতে খুশি দেশের অনলাইন সংস্থা স্ন্যাপডিল প্রভৃতি। তাদের মতে প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই নাকি ‘বড় খেলোয়াড়রা নিয়ম ভাঙছে’। স্ন্যাপডিলের সিইও কুণাল বহেল বলেছেন, ‘প্রত্যেক বিক্রেতাকে এক পর্যায়ে নিয়ে আসতে সাহায্য করবে নয়া নীতি’। বাণিজ্য প্রতিযোগিতাকে বিধিনিষেধের বাঁধনে বাঁধতে হবে? অবাধ বাণিজ্যের উপাসকদের মুখে এ কী কথা!

স্পষ্টতই অন্য সমস্ত সরকারি নীতির মতোই দেশীয় পুঁজিপতিদের অঙ্গুলিহেলনেই এই নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়েছে সরকার। মনে পড়ে, বর্তমানে যাঁরা বিজেপির প্রবল বিরোধিতা করে, আত্মহত্যাকারী কৃষকদের দুঃখে চোখের জলের গঙ্গা-যমুনা বইয়ে দিয়ে সেই নদীতে ২০১৯-এর ভোটের তরী পাড়ি দিয়ে আবার দিল্লির সিংহাসনে বসার স্বপ্ন দেখছেন, নব্বই-এর দশকে সেই কংগ্রেস সরকারের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এবং পরে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর আমলেই নয়া শিল্প ও আর্থিক নীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতা, খোলাবাজার, মুক্তবাজার প্রভৃতি নীতি ঘোষণা করা হয়েছিল। তখন অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত ক্রেতাসমাজকে এই বলে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল যে, এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের উন্নত মানের রকমারি পণ্য ভারতবাসী কিনতে পারবে। উন্নত বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পড়ে ভারতীয় সংস্থাগুলি তাদের পণ্য ও পরিষেবার গুণগত মান উন্নত করতে বাধ্য হবে, ইত্যাদি। অর্থাৎ যেন জনসাধারণের সুবিধের কথা ভেবেই এই উদারিকরণ, বিশ্বায়ন প্রভৃতি চালু করা হয়েছিল। ব্যাঙ্ক, বিমা, টেলিকম প্রভৃতি একের পর এক ক্ষেত্র এই যুক্তিতে দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এরই পথ বেয়ে সরকারি বদান্যতায় নিয়ে আসা হল খুচরো ব্যবসায় অবাধ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদন এবং বনেদি সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির দেশগুলোর অনুকরণে সারা দেশ জুড়ে গড়ে তোলা হল মল-এ কেনাকাটা করার কালচার। তখনও সারা দেশ জুড়ে সাবেক ছোট ছোট দোকানদার এবং বাজার কমিটিগুলোর আপত্তি কানে তোলা হয়নি। ক্রমে ইন্টারনেটের আগমন এবং অনলাইন কেনাকাটার বাজার তৈরি হল এবং উন্নত বিশ্বে ইতিমধ্যেই এই ব্যবসায় অভিজ্ঞ বিভিন্ন সংস্থার হাত ধরে ভারতীয় বহুজাতিক পুঁজিগুলোও সাড়ম্বরে এই ব্যবসায় নেমে পড়ল। মজার ব্যাপার হল, মল গড়ে তোলার সময় যে বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর স্বার্থে ছোট স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আপত্তি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলো কানে তোলেনি, বরং এই বিশাল বিশাল মল-মাল্টিপ্লেক্স গড়ে তোলাকে ‘উন্নয়ন হচ্ছে’ বলে প্রচার করেছিল, তারাই সরকারের কাছে অভিযোগ আনতে শুরু করল যে, অনলাইন কেনাকাটার বাড়বাড়ন্তের ফলে তাদের বিক্রিবাটা নাকি বছরে ৪০ শতাংশ কমে গেছে। এখন আবার বহুজাতিক অনলাইন সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে দেশীয় সংস্থাগুলো অভিযোগ করছে যে, বহুজাতিকরা বিপুল ছাড় দেওয়ার ফলে দেশীয় সংস্থাগুলো প্রতিযোগিতায় মার খাচ্ছে এবং সেইজন্য তাদের খুশি করতে কেন্দ্রীয় সরকার বহুজাতিক অনলাইন সংস্থাগুলোকে এদেশে ছাড় দেওয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করছে। এমনকী অতি দ্রুত ডেলিভারি দেওয়ার ওপরেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। এখন আর দক্ষ এবং উন্নত পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পরিষেবার মান উন্নয়নের তত্ত্ব তাদের মনে থাকছে না।

বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন যে, চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত, মরণোন্মুখ বিশ্ব পুঁজিবাদ এবং তার অবিচ্ছেদ্য অংশ ভারতীয় পুঁজিবাদ নিজেদের সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে যতই নিত্যনতুন টোটকার ব্যবস্থা করতে চাইছে ততই সেই নতুন নতুন ব্যবস্থাগুলোই অচিরে আবার নতুন নতুন গভীরতর সংকটের জন্ম দিচ্ছে। এই ঘটনা তারই একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ। শুধু এ দেশেই নয়, বিশ্বায়নের চ্যাম্পিয়ন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিই এখন নবোদিত চীনা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির দাপটে গোটা বিশ্বে এমনকী নিজের দেশেও প্রতিযোগিতায় হটে গিয়ে, নিজেদেরই অঙ্গুলিহেলনে চলা ডব্লিউটিও-র নীতির বিরোধিতা করে চীনা পণ্যের ওপর বিপুল শুল্ক চাপাচ্ছে। উদারিকরণের বদলে আবার ‘দেশীয়’, ‘জাতীয়’ প্রভৃতি গণ্ডিবদ্ধ অর্থনীতির স্লোগান তুলছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দুঃখজনক পতনের পর গড়ে ওঠা একমেরু বিশ্বের অধীশ্বর সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিকুল নিজেরাই এখন বিশ্ব জুড়ে একাধিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক বাণিজ্যযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। প্রত্যেকেই অন্য দেশে অবাধ বাণিজ্য করতে চাইছে কিন্তু নিজের দেশে বিদেশি পুঁজি ঢুকতে দিতে নারাজ। এই বিষয়ে স্বদেশের সাধারণ মানুষের সমর্থন আদায়ের জন্য জনসাধারণের দেশপ্রেমের আবেগকে কাজে লাগিয়ে জাতীয়তাবাদী জিগিরও তোলা হচ্ছে। এসবেরই একমাত্র লক্ষ্য একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থ সংরক্ষণ। সাধারণ মানুষের জীবনজীবিকার স্বার্থের সঙ্গে এর দূরতম সম্পর্কও নেই।

মগরাহাটে মদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে যত্রতত্র মদের দোকান খোলার বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছে ব্যাপক আন্দোলন। মগরাহাট এবং উস্থি দুটি ব্লক জুড়ে মদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলছে। যত্রতত্র ঢালাও মদের লাইসেন্স দেওয়ার সরকারি নীতি, প্রতি পঞ্চায়েতে মদের দোকান খোলা, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের জঘন্য প্রচেষ্টা প্রভৃতির বিরুদ্ধেমগরাহাট মানবাধিকার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, পথসভা প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠেছে। ৩০ ডিসেম্বর উস্থি বাজারের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন মানবাধিকার ও সম্প্রীতি রক্ষা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডঃ মনোজ গুহ, অধ্যাপক মহম্মদ শাহনওয়াজ সহ বিভিন্ন স্থানীয় নাগরিক। কনভেনশন থেকে ৩৫ জনের একটি গণকমিটি গঠন করা হয়।

৬ জানুয়ারি মগরাহাট ব্লকের ধামুয়ার বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে অপর একটি মদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নাগরিক কনভেনশনে বহু স্থানীয় মানুষ অংশ নেন। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা সোমা রায়, মহিউদ্দিন মান্নান, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নাজিরা মণ্ডল এবং স্থানীয় নাগরিক হাজি আলমাত, শিক্ষক কাঞ্জিলাল সাঁতরা, আসলাম শেখ, স্বপন গায়েন প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন ডঃ মনোজ গুহ। কনভেনশন থেকে মগরাহাট ব্লক জুড়ে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ৩৭ জনের গণকমিটি গঠন করা হয়।

এদিকে মগরাহাট ব্লকের জয়নগর সংলগ্ন তসরালায় একটি মদের দোকান ও বার খোলার চেষ্টার বিরুদ্ধে স্থানীয় তসরালা, তাঁতিহাটি ও আশেপাশের মহিলারা এবং সাধারণ মানুষ আন্দোলনে ফেটে পড়েন। গত নভেম্বরে ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে একটি মতবিনিময় সভার মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের সূচনা। সভায় ডি ওয়াই ও-র জেলা সভাপতি সঞ্জয় মণ্ডল, স্থানীয় নাগরিক স্বপন গায়েন, নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির রাজ্য সম্পাদক কল্পনা দত্ত উপস্থিত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে মহিলাদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে মহিলা সাংস্কৃতিক মঞ্চ। স্বাক্ষর সংগ্রহ, পথসভা, বৈঠক, প্রতিবাদ সভা, থানা ডেপুটেশন প্রভৃতির মাধ্যমে আন্দোলন চলতে থাকে। ৩০ ডিসেম্বর সহস্রাধিক মানুষ এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন। মিছিলে বহু শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীবী ও বিরাট সংখ্যক মহিলা সহ সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মিছিলের লোকজন গোচরণ সাহাপাড়া মোড়ে এক ঘণ্টা পথ অবরোধ করা হয়। অবরোধে বক্তব্য রাখেন ডাঃ পুলকেন্দু ঘোষ, স্বপন গায়েন, সঞ্জয় মণ্ডল, শিক্ষক গণেশ লাহা, রেখা নস্কর, এম এস এসের জেলা সম্পাদিকা মাধবী প্রামাণিক প্রমুখ। ৩১ ডিসেম্বর তসরালায় নির্মীয়মাণ মদের দোকানের সামনে রাস্তার ওপর একটি মদ বিরোধী গণকনভেনশন সংগঠিত করা হয়। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক কানাই চন্দ্র নস্কর। এখানে সাত শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন পাশের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক সাহা, শিক্ষক সুনির্মল দত্ত, এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা কমিটির সদস্য সুজিত পাত্র, সাইদুল ইসলাম প্রমুখ। ১ জানুয়ারি ওই দোকানের সামনে অবস্থান সংগঠিত হয়। সেখানেও সাত শতাধিক স্থানীয় মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ৩১ ডিসেম্বর মদের দোকানটি খোলার পরিকল্পনা থাকলেও এখনও তা খুলতে পারেনি। নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন চলছে। কমিটি ২৩ জানুয়ারি নেতাজি জয়ন্তী পালনের কর্মসূচি নিয়েছে।

ইন্টার্ন নয়, স্থায়ী শিক্ষক চাই

বিক্ষোভ নবান্নে, ডি এম দপ্তরে

স্থায়ী শিক্ষকের পরিবর্তে ইন্টার্ন শিক্ষক নিয়োগ করা হলে শিক্ষার মানের অবনমন ত্বরান্বিত হবে। রাজ্যে ইতিমধ্যেই যাার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা প্রশিক্ষণরত তাদের নিয়োগের কোনও সদিচ্ছা সরকারের লক্ষকরা যাচ্ছে না। ইন্টার্ন নয়, অবিলম্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের নিয়োগ করার দাবিতে ১৭ জানুয়ারি নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি দিল বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (বিপিটিএ)। সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা বলেন, এদিন পাশ-ফেল চালু এবং ডি এল এড প্রশ্ন ফাঁসের তদন্তের দাবিও জানানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী দেশব্যাপী শিক্ষকদের ডি এল এড পরীক্ষা চলছে। এই পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের কোনও তদন্ত এখনও সরকার করেনি। অথচ তার সমূহ দায় শিক্ষকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইন্টার্ন শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও। ১৭ জানুয়ারি দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে পুরুলিয়া শহরে মিছিল করে ডি এম দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পোড়ানো হয় এই সিদ্ধান্তের সার্কুলার। তাদের দাবি, অবিলম্বে সমস্ত শূন্য পদে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল প্রথা চালু করতে হবে।

মেঘালয় ঃ খনির অতল গহ্বরে ১৬ শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

মালিকের মুনাফা-লালসা ও সরকারের অবহেলাই দায়ী

কাগজের প্রথম পাতা থেকে ভিতরের পাতায় সরে গেছে খবরটা। মানুষের মন থেকেও খানিকটা হারিয়ে গেছে মেঘালয়ের কসান খনির মধ্যে আটকে পড়া ১৬ শ্রমিকের যন্ত্রণার কথা। পানীয় জল, খাদ্য, বাতাসহীন অবস্থায় দিনের পর দিন খনির অতল গহ্বরে তাঁদের আত্মরক্ষার লড়াইয়ের কথা। আসাম থেকে আসা ও স্থানীয় কিছু শ্রমিক ১৩ ডিসেম্বর থেকে খনিগহ্বরে জলমগ্ন অবস্থায় আটকে পড়েছেন। দুর্গম পাহাড়ি এলাকার এই অবৈধ খনিতে এক মাসের বেশি তাঁরা কীভাবে রয়েছেন খোঁজ দিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। ২০১৪ সালে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণার পরেও এই 'র‍্যাট হোল' খনিগুলি চলছে কীভাবে? উত্তর সহজে মিলবার নয়। অবশেষে এক মাস তিন দিন পরে ১৬ জানুয়ারি এক শ্রমিকের দেহাংশের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাও নৌসেনার দূরনিয়ন্ত্রিত যানের সঙ্গে লাগানো অত্যাধুনিক ক্যামেরার সাহায্যে। বাকিদের মর্মান্তিক পরিণতি নিয়েও আর কোনও সন্দেহ নেই।

খনিগহ্বরে অসহায় শ্রমিকদের এভাবে মৃত্যুই কি ভবিতব্য? এই সমস্ত খনিতে অত্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতিতে ও পুরোপুরি নিরাপত্তাহীন পরিবেশে কয়লা তোলা হয়। এভাবে কয়লা উত্তোলনে খরচ অত্যন্ত কম, ফলে মুনাফা হয় বেশি। এই বিষয়ে কয়েকটি সমীক্ষক সংস্থা, ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল, মেঘালয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ইত্যাদি মাঝে মাঝে কিছু কাগুজে সতর্কবাণী দেয়। ভূমিকম্প প্রবণ ও নরম মাটিপূর্ণ মেঘালয়ের পাহাড়ে এই 'র‍্যাট হোল' খনি যে কী মারাত্মক তা বারবার বিশেষজ্ঞরা বলেছেন। মালিকরা যথারীতি তাতে কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করে না। পরিবেশ দূষণ এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও তাদের জীবনের বিনিময়ে মালিকরা কেবল লাভের অঙ্কই বাড়িয়ে চলে। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা এক শ্রমিকের মায়ের কথায় চরম অসহায়তা ফুটে উঠেছে— খনিতে যেতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু আর কোনও কাজ না পেয়ে সংসার চালানোর জন্য ও গেছে। খনির কাজে না গেলে অনাহারে মৃত্যু, আর খনিতে গেলে দুর্ঘটনায়, মালিকের দায়িত্বহীনতায় মৃত্যু— আজও কেন এরই যে কোনও একটাকে কেন বেছে নিতে হচ্ছে শ্রমিকদের?

খনিমালিকদের ক্রমবর্ধমান লালসা মেটাতে শ্রমিকদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়, মালিকের মুনাফা বাড়াতে অহরহ জীবন বলি দিতে হয়। খনি গহ্বরে হিমশীতল অন্ধকারে, সংকীর্ণ সুড়ঙ্গের মধ্যে দমবন্ধকর পরিবেশে দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে যায় তারা। উদ্ধারকারীরা এখন বলছেন, ওই সুড়ঙ্গে একটা মানুষের উবু হয়ে বসার মতো জায়গা নেই। দিনের শেষে যখন বাড়ির পথে পা বাড়ায় শ্রান্ত-ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত দেহে, তখন পরের দিন কাজ করার মতো অবস্থা থাকে না। তবুও অভাবের জ্বালায় আবার তাদের নামতে হয় ওই ইঁদুরের গর্তে। নিত্যদিনের গতিপথে শ্রমিকরা মালিকের কাছে এক একটা সংখ্যামাত্র। খনি-ধসে শ্রমিক মৃত্যুর বহু ঘটনা সংবাদমাধ্যমে খবরও হয় না। কারণ প্রত্যন্ত ও সংকীর্ণ পাহাড়ি অঞ্চলের বহু দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকে না কেউ। ফলে সেগুলি ধামাচাপা পড়ে যায়। মালিকরা দালালের মাধ্যমে খনি শ্রমিকের পরিবারের হাতে নামমাত্র অর্থ গুঁজে দিয়ে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করে। নিরন্ন-অসহায় শিশুদের মুখের দিকে তাকিয়ে পরিবারের সদস্যরা বাধ্য হয় তা মেনে নিতে, কখনও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কিন্তু অসহায়, অসংগঠিত গরিব মানুষ গলা তুলে কথা বলতেও ভয় পায়। মালিকের পোষা গুণ্ডাবাহিনী মারধোর করে শায়েস্তা করতে নামে। ভয় দেখিয়ে হুমকি দিয়ে অথবা পরিবারের কাউকে খনিতে কাজ দেওয়ার নাম করে একটা মিটমাটের চেষ্টা করে। আবার নতুন শ্রমিক খুঁজে আনে মালিকের দালালরা।

শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ মালিকদের কাছে বেশি লাভজনক। 'ইঁদুরের গর্ত' এই খনিগুলিতে হামাগুড়ি দিয়ে সহজে ঢুকে শিশুরা কয়লা সংগ্রহ করতে পারে। মজুরিও কম দিলে চলে যায়। এই হচ্ছে প্রতিটি খনির ইতিহাস। মেঘালয়ের জয়ন্তী ও গারো পাহাড়ের খনিগুলিও সেরকমই। কর্তৃপক্ষের ১ লাখ ক্ষতিপূরণ হাতে পেয়ে খনিগহ্বরে সন্তান হারানো পিতা রহমানের মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি— আমার সন্তানের দাম মাত্র ১ লাখ। যদিও মৃতদেহ না পাওয়া গেলে কিংবা মৃতের পরিজনরা উপযুক্ত প্রমাণ দেখাতে না পারলে ক্ষতিপূরণটুকুও দেওয়া হয় না।

পুঁজিবাদী এই সভ্যতা হাজার-লক্ষ টাকায় মানুষের দাম ধার্য করে। দুর্ঘটনা ঘটলে কিছু সংখ্যা মুছে দেয় শ্রমিক-তালিকা থেকে। এবার মেঘালয়ে আটকে পড়া স্থানীয় তিন শ্রমিক ফিরে আসায় এবং একসাথে বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিখোঁজ হওয়ায় সাড়া পড়েছে কিছুটা। ওই শ্রমিকদের বেশিরভাগই আসাম, এমনকী নেপাল থেকেও আসেন পেটের দায়ে। মহাজনদের থেকে ধার নিয়ে চাষ করতে গিয়ে মহাজনের পাহাড়প্রমাণ সুদের খপ্পরে পড়ে এদের ঋণগ্রস্ত দশা। ফলে চাষ করে কিছু আয় হলেও তা মহাজনের পকেটেই চলে যায়। বিকল্প কাজ নেই। দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাটের মতো দূরবর্তী রাজ্যে পাথরখাদানে কাজ করা কষ্টকর শুধু তাই নয়, পাথরখাদানে কাজ করতে গিয়ে গত বছরে আসামের একটা গ্রাম থেকেই শুধু ২০০ জন যক্ষ্মা ও শ্বাসকষ্টে মারা গেছেন। খনির তুলনায় খাদানে মাইনেও কম। ফলে ধার শোধ করতে অভাবি মানুষগুলিকে ছুটতে হয় মেঘালয়ের মৃত্যু গহ্বরের দিকে। খনিতে কয়লা প্রায় নিঃশেষ জেনেও মালিকরা নিত্যনতুন ফাঁদ পাতে আর তাতে পা দিয়ে শেষ হয়ে যায় ১২ থেকে ২৫ বছরের অসংখ্য শ্রমিক। মেঘালয়ের দুর্ঘটনাগ্রস্ত খনিতেও কয়লা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। অন্য খনিতে কাজ দেওয়ার চুক্তি করে কিংবা বকেয়া পাওনা-গণ্ডা মেটানোর অজুহাত দিয়ে বহু শ্রমিককে জোর করে আটকে রেখেছিল মালিকের ভাড়াটে গুণ্ডারা।

মেঘালয়ের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে তৎপর হয়ে উঠেছে। আসামের বিজেপি সরকারও শ্রমিকদের মৃত্যু গহ্বর থেকে ফিরিয়ে আনার কোনও চেষ্টাই করেনি। জল বের করা যাচ্ছে না অজুহাত দিয়ে মেঘালয় সরকার হাত গুটিয়ে বসে থেকেছে দীর্ঘদিন। অন্য কোনও রাজ্যের উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প ব্যবহার করে কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায়, মিলিটারি নামিয়ে, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিমের সাহায্যে এই মানুষগুলির উদ্ধারে কি এগিয়ে আসতে পারত না সরকার? খনি মালিক জানত খনি বহুদিন থেকে প্লাবিত। যে কোনও সময় ভেসে যেতে পারে শ্রমিকরা। তাও নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা করেনি। খনি মেরামতে যুক্ত এক ব্যক্তি বলেছেন, 'খনিতে সারাক্ষণই জল থাকত। আমার কাজ ছিল শ্রমিকরা ঢোকার চার-পাঁচ ঘণ্টা আগে জল ছেঁচে ফেলা, কিন্তু জল জমা বন্ধে কর্তৃপক্ষ কোনও উদ্যোগ নিত না। কারণ আরও ১০০০টি খনি টানেলের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তা একটা সমুদ্রের রূপ নিয়েছিল।' মুনাফায় যাতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য শ্রমিকদের জীবন চরম বিপদসীমায় রয়েছে জেনেও মালিকদের ঘাঁটায়নি সরকার। তার পরিণাম হঠাৎ প্রবল জলস্রোতে ভেসে যাওয়া শ্রমিকদের অসহায় মৃত্যু। মালিকরা জানে এই অপরাধমূলক কাজকর্ম করলেও তাদের কোনও শাস্তি হবে না, এমনকী জবাবদিহি করারও প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের উপর রয়েছে সরকারের আশীর্বাদ। কংগ্রেস, বিজেপি থেকে শুরু করে তথাকথিত আঞ্চলিক স্বার্থের ধ্বজাধারী সব ভোটবাজ দলের নেতারা এদের পয়সায় পুষ্ট। এই মালিকদের ধরবে কে?

আর এত 'মন কি বাত' করেন যে প্রধানমন্ত্রী তিনিও চুপ করে বসে রইলেন। এই ঘটনার পর তিনি আসামে গিয়ে ব্রিজ উদ্বোধন করে ছবিতে পোজ দিয়েছেন, কিন্তু পাশের রাজ্য মেঘালয়ে গিয়ে শ্রমিকদের খুঁজে বের করা নিয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেননি। কারণ এই খবরের টিআরপি নেই, যাতে ভোটবাক্স ভরাতে কাজে লাগাতে পারে। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে গুজরাটে ২০০ ফুট উঁচু বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি উদ্বোধন হয়ে গেল, কিন্তু ৩০০ ফুট নিচে জলের তলায় খনি শ্রমিকদের কাছে কোনও যন্ত্র পৌঁছনো গেল না একটু অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে! ৩০০০ কিমি রেলপথ ২০ ঘণ্টায় অতিক্রম করার বুলেট ট্রেন চালু করার জন্য মোদিজিদের ঘুম নেই। কিন্তু এই শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন ছিল একটুকরো খাবার, একটু অক্সিজেন যা অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে অনায়াসেই করা যেত। তা করা হল না। সরকার কতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হলে উদ্ধারের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প আনতে ১৫ দিন পার হয়ে যায়? এই মর্মান্তিক ঘটনা যে সংবাদমাধ্যমে পিছনে চলে যায়, সেখানে প্রতিদিন চলে মোদি-রাহুল তরজা। কে কার সঙ্গে আলিঙ্গন করছে, কে কার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপছে তাই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টার ধারাবিবরণী, পাতার পর পাতা লেখা চলছে। কিন্তু খনি শ্রমিকদের দুরবস্থা নিয়ে এদের মাথাব্যথা নেই। রাহুল গান্ধীও সত্যি যদি কিছু করতে চাইতেন, মেঘালয়ের কংগ্রেস সরকারকে তিনি হাত গুটিয়ে থাকতে দিলেন কেন? কোনও পদক্ষেপ নিতে পারলেন না কেন?

মালিকরা অবৈধ খনি থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করছে, আর সরকার-প্রশাসন তাদের মদত জোগাচ্ছে। শ্রমিকরা মরলেও সরকারের কিছু আসে যায় না। কারণ এই খনি মালিকরাই নির্বাচনে টাকা জোগাচ্ছে ক্ষমতাশালী দলগুলিকে। ফলে পরস্পরের বোঝাপড়ায় এই অবৈধ খনিগুলি চলছে অবাধে। এই দুষ্টচক্রের ফাঁদেই বলি হতে হচ্ছে অসংখ্য শ্রমিককে, মেঘালয়ের খনি শ্রমিকদের মর্মান্তিক পরিণতিও সে কারণেই।

বিডিও-র বাড়িতেই নির্যাতিতা নাবালিকা

কোচবিহারে পরিচারিকা সমিতির বিক্ষোভ

কোচবিহার শহরের ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা কালচিনি ব্লকের জয়েন্ট বিডিও এবং তাঁর স্ত্রীর অত্যাচারে গুরুতর আহত হল এক নাবালিকা। ওই পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ কিশোরী তাদের ঘরে পরিচারিকার কাজ করত। সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হওয়ায় বিডিও-র স্ত্রী তাকে শাবল দিয়ে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয়। মারের চোটে তার সর্বাঙ্গে কালসিটে পড়ে যায়। বালিকার আর্তনাদ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এই সংবাদ পেয়ে ১৭ জানুয়ারি সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি কোচবিহারে সদর মহকুমাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি এবং বালিকার যথাযথ চিকিৎসার দাবি জানায়। ১৯ জানুয়ারি পরিচারিকা সমিতির জেলা সম্পাদক ফিরোজা আহমেদ এবং বালিকার মামীমা কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় এফআইআর করেন ও শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনে অভিযোগ জানান। এই নির্যাতনের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে এ আই এম এস এস।

ধান কেনায় দুর্নীতি

একের পাতার পর

বহু রাজ্য কৃষিঋণ মকুব করলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে নীরব। সেচের অভাবে বর্তমানে বোরো চাষ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। সেচের খরচ বেড়ে চলেছে ডিজেল এবং বিদ্যুতের দাম বাড়ায়। অভাবগ্রস্ত কৃষকরা সময়মতো বিদ্যুতের বকেয়া বিল না মেটাতে পারায় বহু জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে পূর্ব বর্ধমান জেলায় কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটি ১৭ জানুয়ারি জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। কমিটির সম্পাদক অনিরুদ্ধ কুণ্ডু বলেন, ধানের সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি ২৫০০ টাকা, সমস্ত গ্রামে ধানক্রয় কেন্দ্র স্থাপন, টোকেন দুর্নীতি বন্ধ করা, কৃষিতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ সহ ১৫ দফা দাবিপত্র জেলাশাসককে দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

মহান লেনিন স্মরণে

২১ জানুয়ারি রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান রূপকার কমরেড লেনিনের ৯৫তম প্রয়াণ বার্ষিকীতে কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ সহ অন্যান্যরা

চিটফান্ডে প্রতারিতদের নবান্ন অভিযানে লাঠিচার্জের নিন্দা

অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোশিয়েশনের নবান্ন অভিযানের উপর ২১ জানুয়ারি পুলিশ যে নৃশংস লাঠিচার্জ করেছে তার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (সি) দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ওই দিন এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

"চিটফান্ডের আমানতকারীদের টাকা ফেরত, এজেন্টদের নিরাপত্তা, মৃত ও আত্মঘাতী এজেন্ট ও আমানতকারীদের পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। দাবি আদায় না হওয়ায় আজ তাঁরা বাধ্য হয়ে যখন 'নবান্ন অভিযান'-এর কর্মসূচি নিয়েছিলেন তখন পুলিশ পাঁচ শতাধিক বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করেছে, লাঠিচার্জ করেছে এবং কয়েকজন মহিলাকে মাথায় আঘাত করে গুরুতরভাবে আহত করেছে। আমরা এই নৃশংসতার তীব্র প্রতিবাদ করছি। যাঁরা আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তাঁদের উপযুক্ত চিকিৎসার দাবি করছি। রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের দাবি, অবিলম্বে আমানতকারী ও এজেন্টদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।"

জলাতঙ্ক ভ্যাকসিন অমিল দোষীদের শাস্তি চায় সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম

সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের সভাপতি ডাঃ প্রদীপ ব্যানার্জী এবং সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস ১৬ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

সরকারি হাসপাতালে অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিনের সরবরাহ অত্যন্ত কম। অন্য দিকে এই ভ্যাকসিনের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় সম্প্রতি রাজ্য সহ সারা দেশে কুকুর সহ জলাতঙ্কের বাহক প্রাণীর কামড়ে জলাতঙ্ক রোগীর সংখ্যা এবং মৃত্যুর সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। জলাতঙ্ক প্রতিরোধী ভ্যাকসিনের মতো জীবনদায়ী ওষুধের সরবরাহ কীভাবে প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে এল অবিলম্বে সরকারকে তার তদন্ত করে সত্য উদঘাটন করতে হবে এবং এর জন্য দায়ী মন্ত্রী-আমলা ও স্বাস্থ্য কর্তাদের শাস্তি দিতে হবে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ, বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ

বাংলার বিশিষ্ট কবি শ্রীজাত আসামের শিলচরে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন এবং হোটেলে যে অনুষ্ঠানটি চলছিল, সেখানেও ভাঙচুর চালানো হয়েছে। আক্রমণের অজুহাত, প্রায় বছর দুয়েক আগে রচিত শ্রীজাত-র একটি কবিতার বিষয়বস্তু এবং কিছু শব্দ। যারা এই আক্রমণ সংগঠিত করেছেন, খবরে প্রকাশ, তারা বিজেপি ঘনিষ্ঠ কোনও একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। এই গোটা ঘটনাটি সম্পর্কে 'শিল্পী সংস্কৃতি-কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চ'র সভাপতি বিভাস চক্রবর্তী এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী ও সান্টু গুপ্ত ১৪ জানুয়ারি এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন— 'আমরা এ জাতীয় নিকৃষ্ট এবং হিংসাশ্রয়ী ঘটনার নিন্দা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। একই সঙ্গে আমরা লক্ষ করছি যে, সমাজের সুস্থ এবং গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের নিন্দা এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও দেশে এজাতীয় ঘটনা ধারাবাবিকভাবে ঘটেই চলেছে। আমরা মনে করি, আমাদের এই গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান প্রতিটি মানুষকে অধিকার দিয়েছে সংবিধান-নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার—তা সভা-সমিতি, শিল্প-সাহিত্য, বিতর্ক-আলোচনা যেকোনও মাধ্যমেই হোক না কেন। কবি শ্রীজাত-র অধিকার রয়েছে কবিতার মাধ্যমে তাঁর অভিমত বা অনুভব প্রকাশ করার। তেমনই সেই অভিমত বা অনুভবের বিরোধিতা কিংবা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকারও স্বীকৃত। কিন্তু কখনওই বিচারের অধিকার নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে নয়, কিংবা দলবদ্ধ গুণ্ডামির দ্বারা নয়। সে-জাতীয় আচরণ বা পদক্ষেপ ফৌজদারি অপরাধ বলেই গণ্য হবে।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলি লক্ষ করলে মনে হতে পারে যে, আমরা একটি অসভ্য বর্বর দেশে বাস করছি, যেখানে কতিপয় মানুষ যে কোনও অজুহাতে আইন-বিচার এবং শাস্তি প্রদানের অধিকার নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে, এবং ক্ষমতাধর রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্রগুলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এবং নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির কারণে আইনভঙ্গকারীদের প্রশ্রয় ও আশ্রয় দিয়ে চলেছে।

আমরা এই ভয়ঙ্কর প্রবণতার অবসান চাই। দেশকে রক্ষা করার জন্য সীমান্তে যে রকম অতন্দ্র প্রহরা আবশ্যক, তেমনি দেশের অভ্যন্তরেও প্রয়োজন নিরন্তর নজরদারি— আমাদের মনে রাখতে হবে, এই প্রবণতাই আজ 'দ্য গ্রেটেস্ট ইন্টারন্যাল থ্রেট টু দ্য কান্ট্রিজ সিকিউরিটি'। আরেকটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন, ঘটনাটির জন্য দায়ী দুষ্কৃতকারীরা কখনওই 'হিন্দুত্ববাদী' হতে পারে না। কারণ কে তাদের স্বীকৃতি দিয়েছে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি বা ব্যাখ্যাকারী রূপে?'

কুকুরের আক্রমণ থেকে নার্সদের বাঁচাতে কর্তৃপক্ষ কোনও দায়িত্বই পালন করেনি

এন আর এস মেডিকেল কলেজে ১৬টি কুকুর হত্যার নিন্দা করে সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস ১৫ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, কয়েকজন নার্সের উপর দোষ চাপিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং কলকাতা কর্পোরেশন যেভাবে দায় এড়াচ্ছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

তিনি বলেন, বেশ কয়েক সপ্তাহ জুড়ে এন আর এস মেডিকেল কলেজের নার্সিং ছাত্রীরা কুকুরের কামড় ও আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে আছেন। একজন ইন্টার্ন (নার্সিং) গত ডিসেম্বরে কুকুরের আক্রমণে হস্টেলের তিনতলা থেকে ঝাঁপ দেন এবং গুরুতর আহত হন। কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে তাঁরা সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে তা ধামাচাপা দেন। ঘটনার পরেই ছাত্রীরা প্রিন্সিপাল সহ আধিকারিকদের ডেপুটেশন দিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। তা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙেনি। কুকুরের নির্বীজকরণ, টিকাদান সহ যা যা করণীয় ছিল কিছুই পুরসভা বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ করেনি। এর দায় কি কর্তৃপক্ষ এড়াতে পারেন? আমরা এস ডি এফ-এর পক্ষ থেকে সমগ্র ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করছি।

১৭ জানুয়ারি আর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, রাজ্যের হাসপাতালগুলোতে যত্রতত্র কুকুর, বিড়াল, শুয়োর ইত্যাদি পশুর অবাধ বিচরণ চলছে। হাসপাতালের ওয়ার্ডের ভিতরে এমনকী রোগীর শয্যার উপরেও এসব প্রাণীদের অবস্থান করতে দেখা যাচ্ছে, এমনকী রোগীদের খাবার খেয়ে নেওয়া, রোগীদের কামড়ে দেওয়া, আঁচড়ে দেওয়া বারংবার ঘটে চলছে। এসব সত্ত্বেও স্বাস্থ্য দপ্তর এবং পুরসভার কর্তারা নির্বিকার। নিয়ম হল, স্বাস্থ্য কর্তাদের সুপারিশ মতো পুরসভার কর্তারা নিয়মিতভাবে হাসপাতাল থেকে কুকুর-বিড়াল ধরে নিয়ে তাদের নির্বীজকরণ করবে যাতে বংশ বিস্তার ঘটতে না পারে। পাশাপাশি কুকুর বিড়ালকে ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। যাতে মানুষকে কামড়ালেও মানুষ জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত না হয়। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই কাজগুলি পুরসভাগুলি দীর্ঘদিন ধরে করছে না। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য কর্তাদেরও তৎপর হতে দেখা যায়নি। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এবং অবিলম্বে হাসপাতালগুলিতে কুকুর-বিড়াল নিয়ন্ত্রণে বৈজ্ঞানিক যে সব ব্যবস্থা রয়েছে তা কার্যকর করার দাবি জানাচ্ছি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com